।। ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ।।

যথার্থ গীতা
(শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা)

।। অথ প্রথমোহধ্যায়ঃ।।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ।। ১।।

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন– "হে সঞ্জয়! ধর্মক্ষেত্রে, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থে সমবেত হয়ে আমার এবং পাণ্ডুপুত্রগণ কি করল?"

অজ্ঞানরূপ ধৃতরাষ্ট্র এবং সংযমরূপ সঞ্জয়। অজ্ঞান মনের অন্তরালে থাকে। অজ্ঞানাবৃত মন ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ; কিন্তু সংযমরূপ সঞ্জয়ের মাধ্যমে তিনি দেখেন ও শোনেন। ধৃতরাষ্ট্র জানেন যে পরমাত্মাই একমাত্র সত্য, পুনশ্চ যতক্ষণ এর থেকে উৎপন্ন মোহরূপ দুর্যোধন জীবিত থাকে, ততক্ষণ এর দৃষ্টি সর্বদা কৌরবগণের উপরেই থাকে অর্থাৎ বিকারের উপরেই থাকে।

শরীর একটি ক্ষেত্র। যখন হৃদয়-দেশে দৈবী সম্পত্তির বাহুল্য ঘটে, তখন এই শরীর ধর্মক্ষেত্রে পরিণত হয় এবং যখন এতে আসুরিক সম্পত্তির বাহুল্য ঘটে, তখন এই শরীর কুরুক্ষেত্রে পরিণত হয়। 'কুরু' অর্থাৎ কর– এই শব্দ আদেশাত্মক। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন– "প্রকৃতিজাত তিনটি গুণের বশীভূত হয়েই মানুষ কর্ম করে।" সে ক্ষণমাত্রও কর্ম না করে থাকতে পারে না, গুণত্রয় তাকে দিয়ে করিয়ে নেয়। ঘুমন্ত অবস্থাতেও কর্ম বন্ধ হয় না, সেটিও সুস্থ দেহের আবশ্যক খোরাক মাত্র। এই

তিনগুণ মানুষকে দেবতা থেকে শুরু করে কীটপর্যন্ত দেহের বন্ধনেই আবদ্ধ করে। যতক্ষণ প্রকৃতি ও প্রকৃতিজাত গুণ জীবিত, ততক্ষণ 'কুরু' সক্রিয় থাকবে। অতএব জন্ম-মৃত্যুময় এই ক্ষেত্র, বিকারযুক্ত এই ক্ষেত্রই 'কুরুক্ষেত্র' এবং পরমধর্ম পরমাত্মাতে প্রবেশ প্রদান করতে পারে যে পুণ্যময় প্রবৃত্তিসমূহ, সেই পুণ্যময় প্রবৃত্তি সমূহের (পাণ্ডবের) ক্ষেত্রই 'ধর্মক্ষেত্র'।

পুরাতত্ত্ববিদ্ পাঞ্জাবে, কাশী-প্রয়াগের মধ্যে এবং অন্যান্য বহু স্থানের কুরুক্ষেত্রের নির্দিষ্ট স্থান অনুসন্ধান কার্যে রত আছেন; কিন্তু গীতাকার স্বয়ং বলেছেন, যে ক্ষেত্রে এই যুদ্ধ হয়েছিল সেই ক্ষেত্রটি কোথায়। **'ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।**' (অ. ১৩/১)– "অর্জুন! এই দেহই ক্ষেত্র এবং যিনি একে জানেন এবং আয়ত্তের অধীনে আনতে পারেন তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ।" এরপর তিনি ক্ষেত্রের বিস্তার সম্বন্ধে বললেন, যাতে দশটি ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার পাঁচটি বিকার ও তিনটি গুণের বর্ণনা আছে। এই দেহই ক্ষেত্র, এক মল্লভূমি। এর মধ্যে যুদ্ধাভিলাষী প্রবৃত্তি দুটি– 'দৈবী সম্পদ্' ও 'আসুরী সম্পদ্', 'পাণ্ডুর সন্তানগণ' ও 'ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানগণ', সজাতীয় ও বিজাতীয় প্রবৃত্তিসমূহ।

তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষের শরণাগত হলে এই দুই প্রবৃত্তির মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়, একেই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংঘর্ষ ও প্রকৃত যুদ্ধ বলা হয়। ইতিহাসের পাতা বিশ্বযুদ্ধের কাহিনীতে পরিপূর্ণ; কিন্তু সেই সব যুদ্ধে যাঁরা বিজয়ী হয়েছেন, তাঁরা কেউই শাশ্বত বিজয়ী হননি, এর মধ্যে প্রতিহিংসা ছিল। প্রকৃতিকে শান্ত করে প্রকৃতির ঊর্ধ্বের সত্তার দিগ্‌দর্শন করা এবং তাতে প্রবেশ করাই প্রকৃত বিজয়। এই হ'ল শাশ্বত বিজয় যার পশ্চাতে পরাজয় নেই। একেই বলে মুক্তি, যার পর জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন নেই।

এইভাবে অজ্ঞানে আবৃত্ত প্রত্যেক মন সংযমের দ্বারা জানতে পারে যে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের যুদ্ধের পরিণাম কি হয়? যার যেমন সংযমবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তেমনি তাঁর দৃষ্টি খুলতে থাকে।

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢং দুর্যোধনস্তদা।

আচার্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ।।২।।

সেই সময় রাজা দুর্যোধন ব্যূহরচনাযুক্ত পাণ্ডবগণের সেনাকে দেখে দ্রোণাচার্যের কাছে গিয়ে এই কথা বললেন–

দ্বৈতের আচরণই 'দ্রোণাচার্য'। যখন অনুভব হয় যে পরমাত্মা থেকে আমরা পৃথক্ (একেই বলে দ্বৈতবোধ) তখনই তাঁকে লাভ করার জন্য ব্যাকুলতা জেগে ওঠে, তখনই আমরা গুরুর খোঁজে বেরিয়ে পড়ি। দুই প্রবৃত্তির মধ্যে একেই প্রাথমিক গুরু বলা যেতে পারে, যদিও পরে সদ্‌গুরু যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই হবেন, যিনি যোগের পূর্ণস্থিতি প্রাপ্ত মহাপুরুষ।

রাজা দুর্যোধন আচার্যের কাছে যান। মোহরূপ দুর্যোধন। মোহই সকল ব্যাধির মূল ও রাজা। দুর্যোধন–দুর অর্থাৎ দূষিত, যো ধন অর্থাৎ সেই ধন। আত্মিক সম্পত্তিই স্থির সম্পত্তি। তাতে যে আবিলতা সৃষ্টি করে, তা মোহ। এই মোহ প্রকৃতির দিকে আকৃষ্ট করে ও প্রকৃত জ্ঞানের জন্য প্রেরণাও প্রদান করে। মোহ আছে বলেই জানার প্রশ্নও আছে, অন্যথা সকলই পূর্ণ।

অতএব ব্যূহরচনাযুক্ত পাণ্ডবগণের সেনাকে দেখে অর্থাৎ পুণ্যজাত সজাতীয় বৃত্তিসমূহকে সংগঠিত দেখে মোহরূপ দুর্যোধন প্রথম গুরু দ্রোণের কাছে গিয়ে বললেন–

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য মহতীং চমূম্।

ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ।। ৩।।

হে আচার্য! আপনার বুদ্ধিমান শিষ্য দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নদ্বারা ব্যূহাকার রচিত পাণ্ডুপুত্রগণের এই বিপুল সৈন্যসমাবেশ দর্শন করুন।

শাশ্বত অচল পদে আস্থা রাখতে পারে যে দৃঢ় মন তাকে বলে 'ধৃষ্টদ্যুম্ন'। একেই বলে পুণ্যময় প্রবৃত্তিসমূহের নায়ক। '**সাধন কঠিন ন মন কর টেকা**'– সাধন কঠিন নয়, মন দৃঢ় হওয়া কঠিন।

এখন দেখুন সেনার বিস্তার–

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি।

যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ।। ৪।।

এই সেনার মধ্যে '**মহেষ্বাসা**'– মহান্ ঈশ্বর তত্ত্বে অবস্থিতি প্রদান করতে সক্ষম, ভাবরূপ '**ভীম**' এবং অনুরাগরূপ '**অর্জুন**' এদের সমকক্ষ অনেক শূরবীর, যেমন– সাত্ত্বিকতারূপ 'সাত্যকি', '**বিরাটঃ**'– সর্বত্র ঈশ্বরীয় ভাবপ্রবাহের ধারণা, মহারথী রাজা দ্রুপদ অর্থাৎ অচল স্থিতি এবং–

ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্যবান্।

পুরজিৎকুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ।। ৫।।

'**ধৃষ্টকেতুঃ**'—দৃঢ় কর্তব্য, '**চেকিতানঃ**'– মন যেখানেই যাক বলপূর্বক সেখান থেকে আকর্ষণ করে ইষ্টে স্থির করা, '**কাশিরাজঃ**'–কায়ারূপ কাশীতেই সেই সাম্রাজ্য, '**পুরুজিৎ**'–স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরকে জয় করতে সাহায্য করে যে, সেই পুরুজিৎ, '**কুন্তিভোজঃ**'–কর্তব্যের দ্বারা জগতের উপর জয়লাভ, নরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ '**শৈব্য**' অর্থাৎ সত্য ব্যবহার–

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান্।

সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ ।। ৬।।

এবং পরাক্রমশালী '**যুধামন্যুঃ**'–যুদ্ধের অনুরূপ মনের বোধ, '**উত্তমৌজাঃ**'-শুভকামনায় মগ্ন, সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু–শুভ আধারলাভ হলে মন ভয়মুক্ত হয়ে যায়– এরূপ শুভ আধারপ্রাপ্ত অভয় মন, ধ্যানরূপ দ্রোপদীর পঞ্চপুত্র–বাৎসল্য, লাবণ্য, সহৃদয়তা, সৌম্যতা, স্থিরতা এরা সকলেই এক-একজন মহারথী। সাধন পথে সম্পূর্ণ যোগ্যতার সঙ্গে চলার শক্তি এরাই জোগায়।

এইভাবে রাজা দুর্যোধন পাণ্ডবপক্ষের ১৫-২০টি নামের উল্লেখ করলেন, যেগুলি দৈবী সম্পদের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। বিজাতীয় প্রবৃত্তির রাজা হওয়া সত্ত্বেও মোহই সজাতীয় প্রবৃত্তি সমূহকে অনুভব করতে বাধ্য করে।

দুর্যোধন নিজের পক্ষের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করলেন। এই যুদ্ধ পার্থিব যুদ্ধ হলে, স্বসৈন্যদলের সংখ্যা বাড়িয়ে বলতেন। বিকারের সংখ্যা কম প্রদর্শিত করলেন যেহেতু এই বিকারগুলিকেই জয় করতে হবে, এরা বিনাশশীল। কেবল পাঁচ-সাতটি বিকার সম্বন্ধেই বলা হয়েছে, যাদের অন্তরালে বহির্মুখী প্রবৃত্তিসমূহ বিদ্যমান। যেমন—

অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ব্রবীমি তে ।। ৭।।

হে দ্বিজোত্তম! আমাদের পক্ষে যে সকল বিশিষ্ট যোদ্ধা ও সেনাপতি আছেন তাঁদেরকে অবগত হউন। আপনার অবগতির জন্য তাঁদের নাম বলছি–

বাহ্য যুদ্ধে সেনাপতির জন্য 'দ্বিজোত্তম' সম্বোধন অপ্রাসঙ্গিক। বস্তুতঃ গীতাশাস্ত্রে অন্তঃকরণের দুটি প্রবৃত্তির সংঘর্ষের বর্ণনা করা হয়েছে। যেখানে দ্বৈত-এর আচরণই হ'ল 'দ্রোণ'। যতক্ষণ আমরা লেশমাত্রও আরাধ্য থেকে পৃথক্, ততক্ষণ প্রকৃতি বিদ্যমান, দ্বৈত বিদ্যমান। এই 'দ্বি'-কে জয় করার প্রেরণা প্রথম গুরু দ্রোণাচার্যের কাছে পাওয়া যায়। অপূর্ণ শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে জানার প্রেরণা প্রদান করে। এটা পূজাস্থান নয়, এখানে শৌর্যসূচক সম্বোধন হওয়া উচিত।

বিজাতীয় প্রবৃত্তির কে কে নায়ক?–

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিস্তথৈব চ ।। ৮।।

একজন স্বয়ং আপনি (দ্বৈতের আচরণরূপ দ্রোণচার্য), ভ্রমরূপ পিতামহ 'ভীষ্ম'ও আছেন। এই বিকারসমূহ ভ্রম থেকে উৎপন্ন হয়। শেষপর্যন্ত জীবিত থাকে, তাই পিতামহ। সম্পূর্ণ সেনার মৃত্যুর পরেও জীবিত ছিলেন। শরশয্যায় অচৈতন্য অবস্থাতে ছিলেন, তবুও জীবিত ছিলেন। একেই বলে ভ্রমরূপ 'ভীষ্ম'। ভ্রম শেষপর্যন্ত বেঁচে থাকে। এইরূপ বিজাতীয় কর্মরূপ 'কর্ণ' ও সংগ্রাম বিজয়ী 'কৃপাচার্য'। সাধনাবস্থায় সাধক অন্যের প্রতি যে কৃপার আচরণ করেন সেই কৃপাকেই 'কৃপাচার্য' বলে। ভগবান কৃপাধাম ও ঈশ্বরপ্রাপ্তির পর মহাপুরুষের স্বরূপও তদ্রূপ। কিন্তু সাধনাবস্থায় যতক্ষণ সাধক ও পরমাত্মা পৃথক্, বিজাতীয় প্রবৃত্তিগুলি সক্রিয় ও মোহাচ্ছাদিত–এইরূপ পরিস্থিতিতে সাধক যদি কৃপার আচরণ করেন, তবে তিনি নষ্ট-ভ্রষ্ট হয়ে যান। সীতা দয়া করেছিলেন, তার পরিবর্তে তাঁকে কিছুকাল লঙ্কায় প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল। বিশ্বামিত্র দয়া করেছিলেন, তাই পতিত হয়েছিলেন। যোগসূত্রকার মহর্ষি পতঞ্জলিও এই কথাই বলেছেন– **"তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ।" (যোগ০ ৩/৩৭)** অর্থাৎ ব্যুত্থানকালে সিদ্ধি (যোগলব্ধ শক্তি) প্রকট হয়। প্রকৃত পক্ষে সেগুলি সিদ্ধাই পরন্তু কৈবল্য প্রাপ্তির পথে এই সিদ্ধাই তত বড়ই বাধা, যতটা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি। গোস্বামী তুলসীদাসেরও সেই একই নির্ণয়–

ছোরত গ্রন্থি জানি খগরায়া। বিঘ্ন অনেক করই তব মায়া।।

রিদ্ধি সিদ্ধি প্রেরই বহু ভাই। বুদ্ধিহিঁ লোভ দিখাবহিঁ আই।।

(রামচরিতমানস, ৭/১১৭/৬-৭)

মায়া অনেক বিঘ্নসৃষ্টি করে, শক্তি প্রদান করে, এমনকি সিদ্ধে পরিণত করে। এইরূপ সিদ্ধসাধক যদি পাস দিয়ে শুধু হেঁটে যান, তাহলে মরণাপন্ন রোগীও বেঁচে ওঠে। সেই রোগী যদিও সুস্থ হয়ে ওঠে, কিন্তু সাধক যদি সেটা নিজের অবদান বলে মনে করেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই নষ্ট-ভ্রষ্ট হয়ে যাবেন। একজন রোগীর স্থানে হাজার হাজার রোগী তাঁকে ঘিরে ধররে, ভজন-চিন্তনের ক্রম অবরুদ্ধ হয়ে যাবে এবং পথভ্রান্ত হতে হতে প্রকৃতির বাহুল্য হবে। যদি লক্ষ্য দুরে ও সাধক কৃপা করেন তবে কৃপার একেলার ব্যবহারই '**সমিতিঞ্জয়ঃ**'- সমস্ত সেনা-বাহিনীকে জয় করবে। এই কারণে যতক্ষণ সাধক পূর্ণতা লাভ না করছেন, ততক্ষণ এই সব থেকে সাবধান থাকা দরকার। '**দয়া বিনু সন্ত কসাই, দয়া করী তো আফত আই।**' অর্থাৎ দয়া না করলে সাধু কসাইয়ের সমতুল্য, আর দয়া প্রদর্শিত করলেও অধঃপতনের সম্ভাবনা। কিন্তু অপূর্ণ অবস্থায় এই হল বিজাতীয় প্রবৃত্তির দুর্ধর্ষ যোদ্ধা।

এইরূপ আসক্তিরূপ অশ্বত্থামা। জগৎ-এর যে কোন বস্তুর প্রতি আকর্ষণকেই আসক্তি বলে। দ্বৈত-এর আচরণই দ্রোণাচার্য। এই দ্বৈতই আসক্তির জন্মদাতা। শস্ত্রধারণ অবস্থাতে আচার্য দ্রোণকে বধ করা সম্ভব ছিল না। তিনি অজেয় ছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—কৌরবপক্ষের একটি হাতির নাম অশ্বত্থামা, ভীম সেই হাতিটিকে বধ করে "অশ্বত্থামা মারা গিয়েছে" এইরূপ ঘোষণা করুন। এই অপ্রিয় ঘটনার কথা শুনে আচার্য মর্মাহিত হয়ে শিথিল হয়ে যাবেন, সেটাই তাঁকে বধ করার উপযুক্ত সময়। ভীম হাতিটিকে বধ করে প্রচার করেছিলেন, "অশ্বত্থামা মারা গিয়েছে।" আচার্য দ্রোণ ভেবেছিলেন যে তাঁর পুত্র অশ্বত্থামা মারা গিয়েছে, তিনি শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন, ধনুক হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল, তিনি হতাশ, নিশ্চেষ্ট হয়ে যুদ্ধভূমিতে বসে পড়েছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বধ করা হয়েছিল। পুত্রের প্রতি অত্যধিক আসক্তি তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অশ্বত্থামা দীর্ঘজীবী ছিলেন। নিবৃত্তির শেষ মুহূর্তপর্যন্ত বাধা দেয় তা'ই একে অমর বলা হয়েছে।

বিকল্পরূপ বিকর্ণ। সাধনার উন্নত অবস্থাতে মনে কিছু অসাধারণ কল্পনার উদয় হয়। মনে সঙ্কল্প-বিকল্প জাগে যে, স্বরূপলাভের পর ভগবানের তরফ থেকে কিরূপ সিদ্ধাই, অলৌকিক শক্তি প্রদান করা হবে। সাধক ঈশ্বর চিন্তনের পরিবর্তে ঈশ্বরের-ঐশ্বর্যের চিন্তা করতে শুরু করেন। সাধককে একাগ্র হয়ে কর্ম করে যাওয়া উচিত। ফললাভের কামনা করা উচিত নয় কিন্তু যখন তিনি (সিদ্ধাই) যোগলব্ধ শক্তির কামনা করতে শুরু করেন তখন এইরূপ মনোভাব অর্থাৎ বিকল্পকেই বিকর্ণ বলে। এই কল্পনাগুলি অসাধারণ কিন্তু সাধনাতে ভয়ঙ্করভাবে বাধা দেয়।

ভ্রমোৎপাদক শ্বাসই ভূরিশ্রবা। সাধনার স্তর উন্নত হলে পরে সকলেই সাধকের প্রশংসা করতে শুরু করেন যে, ইনি মহাত্মা, সিদ্ধপুরুষ, দিব্যগুণের অধিকারী, তাঁর সমক্ষে লোকপালও বিনীত হয়ে যান। এইরূপ ব্যবহার, প্রশংসা দ্বারা সাধক যখন আনন্দের আতিশয্যে পথহারা হন তখন এইরূপ শ্বাসকেই ভূরিশ্রবা বলা হয়। পূজ্য গুরুদেব বলতেন-"সমাজ যদি পুষ্পবৃষ্টি করে, প্রশংসা করে, বিশ্ববন্দ্য জগদ্‌গুরু বলে তোমার তাতে কিছু লাভ হবে না, শুধু কান্নাকাটি করতে থাকবে, কিন্তু যদি ভগবান তোমাকে সাধুর আখ্যা দেন, তবে সর্বস্ব লাভ করবে, সমাজ বলুক অথবা না বলুক, তুমি সর্বস্ব লাভ করবে।" এইরূপ প্রশংসাতে অভিভূত হওয়াকেই ভ্রমোৎপাদক শ্বাস অর্থাৎ ভূরিশ্রবা বলে। অত্যধিক প্রশংসার ফলে সাধনার হ্রাস হয়। অতএব ভ্রমোৎপাদক শ্বাসই ভূরিশ্রবা। সংযমের স্তর উন্নত হলে পরে যে (বিকৃতি) বিকারগুলি বাধা দেয়, এগুলি তাদেরই নাম। এগুলি বহির্মুখী প্রবৃত্তির অঙ্গ।

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।

নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ।। ৯।।

আমার জন্য প্রাণদান করতে কৃতসঙ্কল্প অনেক শূরবীর অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হয়েছেন। সকলেই আমার জন্য প্রাণদান করতে সঙ্কল্পবদ্ধ; কিন্তু এদের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা পরিগণিত হয়নি। এখন কোন কোন সেনা কি কি ভাবদ্বারা সুরক্ষিত? তা বলছেন—

অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।

পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ।। ১০।।

ভীষ্মদ্বারা রক্ষিত আমাদের সেনা সর্বপ্রকারে অজেয়; কিন্তু ভীমদ্বারা রক্ষিত পাণ্ডবগণের সেনা জয় করা সহজ। পর্যাপ্ত ও অপর্যাপ্তের মত সংশ্লিষ্ট শব্দের প্রয়োগ দুর্যোধনের আশঙ্কাই ব্যক্ত করছে। অতএব দেখতে হবে যে ভীষ্ম কোন সত্তা, যার উপর সম্পূর্ণ কৌরব নির্ভরশীল এবং ভীম কোন সত্তা যার উপর (দৈবী সম্পদ্) সম্পূর্ণ পাণ্ডব নির্ভরশীল। দুর্যোধন এবার নিজের সু-ব্যবস্থার জন্য নির্দেশ দিলেন–

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব এব হি ।। ১১।।

এক্ষণে আপনারা সকলেই ব্যূহসমূহের প্রবেশদ্বারে স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত হয়ে পিতামহ ভীষ্মকেই সকলদিক্ থেকে রক্ষা করুন। যদি ভীষ্ম জীবিত থাকেন, তাহলে আমরা অজেয়, সেই জন্য আপনারা সকলে পাণ্ডবের সঙ্গে যুদ্ধ না করে কেবল ভীষ্মকেই রক্ষা করুন।

কেমন যোদ্ধা ছিলেন ভীষ্ম, যিনি স্বয়ং নিজের রক্ষা করতে অক্ষম, কৌরব সেনাকে তাঁর রক্ষার ব্যবস্থা করতে হচ্ছিল? এটা কোন বাহ্য যোদ্ধা নয়, ভ্রমই ভীষ্ম। যতক্ষন ভ্রম বিদ্যমান, ততক্ষণ বিজাতীয় প্রবৃত্তিগুলি (কৌরব) অজেয়। 'অজেয়' শব্দের অর্থ এই নয় যে, অজেয়কে জয় করা যায় না। অজেয়র অর্থ হল দুর্জয়, একে জয় করা কষ্টসাধ্য। **"মহা অজয় সংসার রিপু, জীতি সকই সো বীর।" (রামচরিতমানস, ৬/৮০ ক)**

যখন ভ্রম মিটে যায়, তখন অবিদ্যা অস্তিত্ববিহীন হয়ে পড়ে। মোহ ইত্যাদি যা কিছু আংশিক পরিমানে টিকে থাকে, তাও শীঘ্রই শেষ হয়। ভীষ্মের ছিল ইচ্ছামৃত্যু। ইচ্ছাই ভ্রম। ইচ্ছার সমাপ্তি ও ভ্রম দূর হওয়া একই ব্যাপার। একথাই সন্ত কবীর সরলভাবে বলেছেন–

ইচ্ছা কায়া ইচ্ছা মায়া, ইচ্ছা জগ উপজায়া।
কহ কবীর জে ইচ্ছা বিবর্জিত, তাকা পার ন পায়া।।

যেখানে ভ্রম নেই, তা অপার ও অব্যক্ত। এই দেহের জন্মের কারণ ইচ্ছা। ইচ্ছাই মায়া এবং ইচ্ছাই এই জগতের উৎপত্তির কারণ। [**'সোহকাময়ত' তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয় ইতি।' (ছান্দোগ্য০ ৬/২/৩)**]। কবীর বলেছেন যে, যিনি সর্বপ্রকার

কামনারহিত, '**তিনকা পার ন পায়া**'- তিনি অপার, অনন্ত, অসীম তত্ত্ব উপলব্ধি করেন। ['**যোহকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি।' (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ৪/৪/৬)**] যিনি কামনারহিত, আত্মাতে স্থির আত্মস্বরূপ, তাঁর কখনও পতন হয় না। তিনি ব্রহ্মে সঙ্গ একীভূত হন। সাধনের আরম্ভে ইচ্ছাগুলি অনন্ত হয়, এই অনন্ত ইচ্ছার শেষ হতে হতে অবশেষে পরমাত্ম-প্রাপ্তির ইচ্ছা শেষ থাকে। যখন এই ইচ্ছাও পূর্ণ হয়, তখন ইচ্ছার বিলুপ্তি ঘটে। যদি এর থেকে শ্রেষ্ঠ কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকত, তাহলে তা লাভ করার ইচ্ছা অবশ্যই জেগে উঠতো। যখন এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু নেই, তখন ইচ্ছাও সমূলে বিনষ্ট হয়। এই ইচ্ছার বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমও নাশ হয়, একেই ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু বলে। এইভাবে ভীষ্মদ্বারা রক্ষিত আমাদের সেনা সর্বপ্রকারে অজেয়। যতক্ষণ ভ্রম দূর না হয়, ততক্ষণ অবিদ্যা সক্রিয় থাকে। ভ্রম দূর হলে, অবিদ্যা ক্রিয়াহীন হয়ে যায়।

ভীমদ্বারা রক্ষিত এদের সেনাকে জয় করা সহজ। ভাবরূপ ভীম। '**ভাবে বিদ্যতে দেবঃ**'–ভাব-এ সেই ক্ষমতা আছে যা অবিদিত পরমাত্মাকেও প্রত্যক্ষ করতে সাহায্য করে। '**ভাব বস্য ভগবান, সুখ নিধান করুণা ভবন।' (রামচরিতমানস, ৭/৯২ খ)** শ্রীকৃষ্ণ একেই শ্রদ্ধা বলেছেন। ভাব-এর সাহায্যে ভগবানকেও বশ করা সম্ভব। এর দ্বারাই পুণ্যময় প্রবৃত্তিসমূহের বিকাশ হয়। এই ভাব পুণ্যের সংরক্ষক ও এত বলবান্ যে পরমদেব পরমাত্মাকেও গোচরে এনে দেয়, অন্যদিকে অতি কোমলও, আজকের ভাব কাল অভাব এ বদলাতে দেরী লাগে না। আজ আপনি বলছেন যে, মহারাজজী খুব ভালো। কাল হয়তো বলবেন– না, আমি দেখেছি, মহারাজজী ক্ষীর খান।

ঘাস পাত যে খাত হ্যাঁয়, তিনহি সতাবৈ কাম।
দুধ মলাই খাত যে, তিনকী জানে রাম।।

অর্থাৎ তৃণভোজীদেরও কাম তাড়না দেয়, যাঁরা দুধ-মালাই খান, ঈশ্বর তাদেরই শরণ দেন।

ইষ্টের আচরণে লেশমাত্রও ত্রুটিবোধ হলে ভাব টলে ওঠে, পুণ্যময় প্রবৃত্তিসমূহ বিচলিত হয়, ইষ্টের সঙ্গে যে সম্বন্ধ তা ছিন্ন হয়, তাই ভীমদ্বারা রক্ষিত তাদের সেনা জয় করা সহজ। মহর্ষি পতঞ্জলিরও সেই একই নির্ণয়– "**স তু দীর্ঘকাল**

নৈরন্তর্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ।" (যোগসূত্র, ১/১৪)। অর্থাৎ দীর্ঘকালপর্যন্ত নিরন্তর শ্রদ্ধা-ভক্তিপূর্বক করে গেলেই সাধন দৃঢ় হয়।

তস্য সঞ্জনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।

সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ।। ১২।।

এই প্রকার সকলেই নিজের বলাবল নির্ণয় করে শঙ্খধ্বনি করলেন। এই শঙ্খধ্বনি হ'ল পাত্রের পরাক্রমের ঘোষণা, যুদ্ধ জয়ের পর কোন্ পাত্র আপনাকে কি দেবে? কৌরব পক্ষে বৃদ্ধ প্রতাপবান্ পিতামহ ভীষ্ম দুর্যোধনের হৃদয়ে হর্ষ উৎপন্ন করে উচ্চস্বরে সিংহনাদের সমান ভয়প্রদ শঙ্খ বাজালেন। সিংহ প্রকৃতির ভয়াবহ দিকের প্রতীক। ঘোর জঙ্গলের নিরবস্থানে নির্জনে সিংহের গর্জন যদি কানে আসে, তাহলে দেহের লোম খাড়া হয়ে যাবে, ভয়ে হৃদয় কাঁপতে শুরু করবে, যদিও সিংহ থেকে আপনি বহুদূরে। ভয় প্রকৃতিজাত, পরমাত্মায় তার স্থান নেই, কারণ পরমাত্মা অভয় সত্তা। ভ্রমরূপ ভীষ্ম বিজয়ী হলে প্রকৃতির যে ভয়ারণ্যের মধ্যে আপনি আছেন, তার থেকেও ভয়ঙ্কর ভয়ের আবরণে আপনাকে ঢেকে ফেলবে। ভয়ের আরও একটি স্তর বৃদ্ধি পাবে, ভয়ের আবরণ আরও ঘন হয়ে উঠবে। ভ্রম এছাড়া আর কিছু দিতে পারে না। অতএব প্রকৃতি থেকে নিবৃত্তিই গন্তব্যে যাওয়ার পথ। সংসারে প্রবৃত্তি ভবাটবী, ঘোর অন্ধকারময়। এর বেশী কোন ঘোষণা কৌরবদের নেই। কৌরব পক্ষ থেকে কয়েকটি বাদ্য একসঙ্গে বেজে উঠল; কিন্তু সেগুলিও ভয় প্রদান করা ছাড়া আর কিছু দিতে পারল না। প্রত্যেক বিকার কিছু না কিছু ভয়ই প্রদান করে। সেই জন্য তাঁরাও ঘোষণা করলেন–

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।

সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোহভবৎ ।। ১৩।।

তদনন্তর অনেক শঙ্খ, ভেরী, ঢোল এবং নরশিঙ্গাদি রণবাদ্য যন্ত্র একসঙ্গে বেজে উঠল, সেগুলির শব্দও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি করল। ভয়সঞ্চার করার অতিরিক্ত কৌরবদের কোন ঘোষণা নেই। বহির্মুখী বিজাতীয় প্রবৃত্তি সফল হলে মোহরূপ বন্ধন আরও ঘন করে দেয়।

এর পর পুণ্যময় প্রবৃত্তিসমূহের দিক্ থেকে ঘোষণা করা হল। যার মধ্যে প্রথম ঘোষণাটি যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের–

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।

মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ।। ১৪।।

অতপর শ্বেতাশ্বযুক্ত (যাতে বিন্দুমাত্র কালিমা বা দোষ ছিল না, শ্বেতবর্ণ সাত্ত্বিক ও নির্মলতার প্রতীক) **'মহতি স্যন্দনে'**–উত্তমরথে উপবিষ্ট যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনও অলৌকিক শঙ্খ বাজালেন। অলৌকিকের অর্থ, লোকাতীত। মৃত্যুলোক, দেবলোক, ব্রহ্মলোক, জন্ম-মৃত্যুর ভয় যতদূরপর্যন্ত সেই সমস্ত লোকের অতীত পারলৌকিক, পারমার্থিক স্থিতি প্রদান করার ঘোষণা যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ করলেন। সোনা-রূপো অথবা কাঠের রথ ছিল না, সেই রথ অলৌকিক ছিল, শঙ্খ অলৌকিক ছিল, অতএব ঘোষণাও অলৌকিক ছিল। একমাত্র ব্রহ্ম সমস্ত লোকের ঊর্ধ্বে স্থিত। সরাসরি ব্রহ্মসঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করাবার ঘোষণা করলেন। কিরূপে তিনি এই স্থিতি প্রদান করবেন?–

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।

পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ ।। ১৫।।

'হৃষীকেশঃ'- যিনি হৃদয়ের সর্বস্বের জ্ঞাতা, সেই শ্রীকৃষ্ণ 'পাঞ্চজন্য' শঙ্খ বাজালেন। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়কে পঞ্চ তন্মাত্রার (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) রসে জড়িয়ে স্বজন অর্থাৎ ভক্তের শ্রেণীতে দাঁড় করাবার ঘোষণা করলেন। ভয়ঙ্করভাবে ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করে সেবকের শ্রেণীতে দাঁড় করানো, হৃদয়ের প্রেরক সদ্‌গুরুর কৃপা। শ্রীকৃষ্ণ যোগেশ্বর সদ্‌গুরু ছিলেন। **'শিষ্যস্তেহহম্'**- ভগবন্! আমি আপনার শিষ্য। বাহ্য বিষয়-বস্তুকে ত্যাগ করে ধ্যানে ইষ্টের অতিরিক্ত অন্য কিছু দেখা, শোনা ও স্পর্শ না করা সদ্‌গুরুর অনুভব সঞ্চারণের উপর নির্ভর করে।

'দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ'- দৈবী সম্পত্তিকে অধীনে করে যে অনুরাগ, সেই অনুরাগই অর্জুন। ইষ্টের অনুরূপ শ্রদ্ধা– যাতে বিরহ, বৈরাগ্য ও অশ্রুপাত হয়, **'গদ্‌গদ গিরা নয়ন বহ নীরা।'**– রোমাঞ্চ হয়, ইষ্ট ছাড়া অন্য কোন বিষয়-বস্তুর লেশমাত্রও সম্পর্ক হয় না, তখন এই অবস্থাকে 'অনুরাগ' বলা হয়। এতদূর সফল হ'বার, পরেই দৈবী সম্পদের উপর প্রভুত্ব লাভ করা সম্ভব হয়, যা পরমদেব পরমাত্মাতে একীভূত হতে সাহায্য করে। এর আরেক নাম ধনঞ্জয়। এক ধন পার্থিব সম্পত্তি, যা দিয়ে শরীর নির্বাহের ব্যবস্থা করা হয়, আত্মার সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ

নেই। এছাড়া স্থির আত্মিক সম্পত্তিই নিজ সম্পত্তি। বৃহদারণ্যকোপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে এই উপদেশ দিলেন যে– ধনসম্পন্ন পৃথিবীর স্বামীত্ব দ্বারাও অমৃতত্বের প্রাপ্তি সম্ভব নয়। এর উপায় হল আত্মিক সম্পত্তি।

ঘোরকর্মা ভীম **'পৌণ্ড্র'** অর্থাৎ প্রীতি নামক মহাশঙ্খ বাজালেন। ভাবের উদ্‌গম ও নিবাসস্থান হৃদয়, তাই এর এক নাম 'বৃকোদর'। আপনাদের ভাব, স্নেহ ছোটদের প্রতি স্বভাবতই থাকে; কিন্তু সেই স্নেহ উৎপন্ন হয় আপনাদের হৃদয়ে, যা গিয়ে মূর্ত হয় ছোটদের প্রতি। এই ভাব অগাধ এবং মহাবলশালী, তিনি প্রীতি নামক শঙ্খ বাজালেন। এই প্রীতি ভাব-এর মধ্যেই নিহিত, তাই ভীম **'পৌণ্ড্র'** (প্রীতি) নামক মহাশঙ্খ বাজালেন। ভাব অত্যন্ত শক্তিশালী; কিন্তু প্রীতির মাধ্যমে তা সঞ্চার হয়।

হরি ব্যাপক সর্বত্র সমানা। প্রেম তে প্রকট হোহিঁ মৈঁ জানা।।

(রামচরিতমানস, ১/১৮৪/৫)

অর্থাৎ ঈশ্বর সর্বত্র সমান রূপেই বিদ্যমান; কিন্তু তাকে প্রকট করতে হ'লে চাই হৃদয়ে প্রেম।

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ।। ১৬।।

কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির 'অনন্ত বিজয়' নামক শঙ্খ বাজালেন। কর্ত্তব্যরূপ কুন্তী ও ধর্মরূপ যুধিষ্ঠির। ধর্মে স্থির থাকলেই **'অনন্ত বিজয়ম্‌'**–অনন্ত পরমাত্মাতে স্থিতি লাভ হবে। যুদ্ধে স্থিরঃ সঃ যুধিষ্ঠিরঃ। প্রকৃতি পুরুষ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংঘর্ষে স্থির থাকেন, অত্যন্ত দুঃখেও বিচলিত হন না, তবেই একদিন যিনি অনন্ত যাঁর অন্ত নেই, সেই পরমতত্ত্ব পরমাত্মাকে লাভ করতে সক্ষম হন।

নিয়মরূপ নকুল 'সুঘোষ' নামক শঙ্খ বাজালেন। যেমন যেমন নিয়ম কঠোর হবে, তেমন তেমন অশুভ লক্ষণগুলি বিলয় হয়ে যাবে ও শুভ পরিস্থিতির উদয় হবে। সৎসঙ্গরূপ সহদেব 'মণিপুষ্পক' নামক শঙ্খ বাজালেন। মনীষীগণ প্রত্যেক শ্বাসকে বহুমূল্য মণির নাম দিয়েছেন। **'হীরা জৈসী শ্বাঁসা, বাতোঁ মেঁ বীতী জায়'**। বাহ্য সৎসঙ্গ সৎপুরুষের বাণী শ্রবণকে বলে, যা এক প্রকার সৎসঙ্গ; কিন্তু যথার্থ সৎসঙ্গ হয় আন্তরিক। শ্রীকৃষ্ণের মতে আত্মাই সত্য ও সনাতন। চিত্ত যখন স্থির হয়ে আত্মার সঙ্গত করে, তখনই হয় প্রকৃত সৎসঙ্গ। এই সৎসঙ্গ চিন্তন, ধ্যান ও সমাধির

অভ্যাস দ্বারা সম্পন্ন হয়। যেমন যেমন সত্যের সান্নিধ্যে স্মৃতি স্থির হবে, তেমন তেমন এক একটি শ্বাসের উপর নিয়ন্ত্রণ হতে থাকবে, ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে মনও নিরুদ্ধ হয়ে আসবে। এইপ্রকার যখন সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হবে, তখন বস্তুলাভ হবে। বাদ্য যন্ত্রের মত আত্মার ধ্বনির সঙ্গে চিত্তের ধ্বনি মিলিয়ে সঙ্গত করাই যথার্থ সৎসঙ্গ।

বাহ্য মণি কঠোর হয়, কিন্তু শ্বাসরূপ মণি পুষ্প থেকেও কোমল হয়। পুষ্প তো বিকশিত হওয়ার পর অথবা বৃন্তচ্যুত হলে শুকিয়ে যায়, কিন্তু আপনি এর পরের শ্বাসপর্যন্ত জীবিত থাকার গ্যারান্টি দিতে পারেন না। কিন্তু সৎসঙ্গ সফল হলে প্রত্যেক শ্বাসের উপর নিয়ন্ত্রণ রেখে লক্ষ্যপ্রাপ্তি সম্ভব। এর বেশী পাণ্ডবদের কোন ঘোষণা নেই; কিন্তু প্রত্যেক সাধন নির্মলতার পথে কিছু না কিছু দূরত্ব অতিক্রম করায়। অতপর বললেন—

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।

ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ।।১৭।।

কায়ারূপ কাশী। পুরুষ যখন চারিদিক্ থেকে মন ও ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করে কায়াতেই কেন্দ্রিত করেন তখন '**পরমেষ্বাসঃ**'—পরম ঈশে বাস করার অধিকারী হন। পরম ঈশ্বরতত্ত্বে অবস্থান দিতে সক্ষম কায়াকেই কাশী বলে। কায়াতেই পরম ঈশ্বরের নিবাস। পরমেষ্‌বাসের অর্থ শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধারী নয় বরং পরম + ঈশ + বাস হয়।

শিখা-সূত্রের ত্যাগই 'শিখণ্ডী'। সাধনা পথের কিছু ভ্রান্ত ব্যক্তিরা আজকাল মুণ্ডিত মস্তকে, সূত্রের নামে গলার উপবীত খুলে রাখে, অগ্নিত্যাগ করে এবং একেই সন্ন্যাস বলে। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বস্তুতঃ শিখা লক্ষ্যের প্রতীক, যেখানে আপনাকে পৌঁছাতে হবে এবং সূত্র সংস্কারের প্রতীক। যতক্ষণ পরমাত্মার প্রাপ্তির না হয়, ততক্ষণ সংস্কারের সূত্রপাত হতেই থাকে, ততক্ষণ ত্যাগ কোথায়? কি প্রকার সন্ন্যাস? এখনও তো তিনি পথিক। যখন প্রাপ্য বস্তুর প্রাপ্তি হয়, পূর্বের সমস্ত সংস্কারের সূত্র ছিন্ন হয়, এইরূপ অবস্থাতে সম্পূর্ণরূপে ভ্রম মিটে যায়। সেইজন্য শিখণ্ডীই ভ্রমরূপ ভীষ্মের বিনাশ করে। শিখণ্ডী চিন্তন-পথের বিশিষ্ট যোগ্যতারূপ মহারথীকে বলে।

'**ধৃষ্টদ্যুম্নঃ**'— দৃঢ় ও অচল মন এবং '**বিরাটঃ**'— সর্বত্র বিরাট ঈশ্বরের প্রসার দেখার ক্ষমতা ইত্যাদি হ'ল দৈবী সম্পদের প্রমুখ গুণ। সাত্ত্বিকতাই 'সাত্যকি'। সত্যের

চিন্তনের প্রবৃত্তি অর্থাৎ যদি সাত্ত্বিকতা বিদ্যমান, তাহলে আর পতনের সম্ভাবনা থাকে না, এই সংঘর্ষে পরাজয় হতে দেয় না।

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে।

সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ।। ১৮।।

অচল পদে প্রতিষ্ঠাদাতা দ্রুপদ এবং ধ্যানরূপ দ্রোপদীর পঞ্চপুত্র সহৃদয়তা, বাৎসল্য, লাবণ্য, সৌম্যতা ও স্থিরতা এরা সাধন পথের শ্রেষ্ঠ সহায়ক মহারথী এবং দীর্ঘবাহুযুক্ত অভিমন্যু এঁরা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাজালেন। বাহু কার্যক্ষেত্রের প্রতীক। মন যখন ভয়মুক্ত হয়, তখন তার শক্তি বহু দূরপর্যন্ত প্রসার লাভ করে।

হে রাজন্! এঁরা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাজালেন। কিছু কিছু দূরত্ব সকলেই অতিক্রম করান, এদের পালন আবশ্যক, তাই এদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া কিছু দূরত্ব, যেটুকু বাকী থাকে, তা মন এবং বুদ্ধির অতীত। ভগবান স্বয়ং অন্তঃকরণে জাগ্রত হয়ে তা অতিক্রম করান। দৃষ্টিরূপে আত্মা থেকে দাঁড়িয়ে যান এবং সম্মুখে স্বয়ং দণ্ডায়মান হয়ে নিজের পরিচয় দেন।

স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।

নভশ্চ পৃথিবীং চৈব তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্ ।।১৯।।

সেই তুমুল শঙ্খধ্বনি আকাশ ও পৃথিবী প্রতিধ্বনিত করে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের হৃদয় বিদীর্ণ করল। সেনা পাণ্ডব পক্ষেও ছিল, কিন্তু হৃদয় বিদীর্ণ হল কেবল ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের। বস্তুতঃ পাঞ্চজন্য, দৈবী শক্তির উপর আধিপত্য, অনন্তকে জয়, অশুভ শান্তি ও শুভের আবির্ভাব নিরন্তর হতে থাকলে এই কুরুক্ষেত্রে, আসুরী সম্পদ্, বহির্মুখী প্রবৃত্তিগুলির হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাবে, তাদের বল ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে থাকবে। পূর্ণ সফলতা লাভ হলে মোহময়ী প্রবৃত্তিগুলি সম্পূর্ণরূপে শান্ত হয়ে যায়।

অথ ব্যবস্থিতান্দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।

প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ ।। ২০।।

হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।

অর্জুন উবাচ

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ।।২১।।

সংযমরূপ সঞ্জয় অজ্ঞানাবৃত মনকে বোঝালেন, যে, হে রাজন্! অতপর **'কপিধ্বজঃ'**– বৈরাগ্যরূপ হনুমান, বৈরাগ্যই যার ধ্বজ (ধ্বজকে রাষ্ট্রের প্রতীক বলা হয়। কারও কারও মতে পতাকা চঞ্চল ছিল, তাই কপিধ্বজ বলা হয়েছে; কিন্তু তা নয়, এখানে কপি সাধারণ বানর নয়, স্বয়ং হনুমানই ছিলেন, যিনি মান-অপমানের হনন করেছিলেন–**'সম মান নিরাদর আদরহীঁ।' (মানস, ৭/১৩/৮)** প্রকৃতির বিষয় বস্তু থেকে আসক্তির ত্যাগই 'বৈরাগ্য'। অতএব বৈরাগ্যই যার ধ্বজ), সেই অর্জুন ব্যবস্থিত রূপে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শস্ত্র চালনার মুহুর্তে ধনুক তুলে **'হৃষীকেশম্'**– যিনি হৃদয়ের সর্বস্বের জ্ঞাতা সেই যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বললেন—হে অচ্যুত! (যিনি কখনও চ্যুত হন না) আমার রথ উভয় সেনার মধ্যে স্থাপন করুন। এখানে সারথীকে আদেশ দেওয়া নয়, ইষ্টের (সদ্গুরুর) প্রতি অনুরোধ করা হয়েছে। কেন স্থাপন করবেন?–

যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।

কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ।। ২২।।

যতক্ষণ আমি যুদ্ধার্থে অবস্থিত এঁদের উত্তমরূপে নিরীক্ষণ না করি যে, এই যুদ্ধোদ্যমে আমাকে কে কে সঙ্গে যুদ্ধ করার উচিত অর্থাৎ এই যুদ্ধ ব্যবসাযে কার কার সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করতে হবে।

যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।

ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ।।২৩।।

দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনের হিতকামী যে সকল রাজাগণ যুদ্ধ করার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁদেরকে আমি দেখতে চাই, সেইজন্য রথ স্থাপন করুন। মোহরূপ দুর্যোধন। মোহমুগ্ধ প্রবৃত্তিসমূহের হিতাকাঙ্ক্ষী যে সকল রাজাগণ যুদ্ধ করবার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁদেরকে আমি দেখে নিই।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুডাকেশেন ভারত।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ।। ২৪।।

ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরুনিতি ।। ২৫।।

সঞ্জয় বললেন– নিদ্রাজয়ী অর্জুনের এইরূপ বলার পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যিনি হৃদয়ের জ্ঞাতা তিনি উভয় সেনার মধ্যে ভীষ্ম, দ্রোণ ও **'মহীক্ষিতাম্'**– দেহরূপ পৃথিবীকে অধিকার করেছেন যে রাজাগণ, সেই সকল রাজাগণের মধ্যে উত্তমরথ স্থাপন করে বললেন– "হে পার্থ! সমবেত কৌরবগণকে অবলোকন কর।" এখানে উত্তম রথের অর্থ সোনা, রূপোর নির্মিত রথ নয়। সংসারে উত্তমের পরিভাষা নস্বর বস্তুর অনুকূলতা-প্রতিকূলতার উরপ দেওয়া হয়; কিন্তু এই পরিভাষা পূর্ণ নয়। যা আমাদের আত্মা অর্থাৎ স্বরূপের সঙ্গে সর্বদা সহযোগিতা করে, তাই একমাত্র উত্তম, যারপর 'অনুত্তম' অর্থাৎ মলিনতা বলে কিছু থাকে না।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথপিতামহান্।
আচার্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ।। ২৬।।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি।।

অতপর সুনিশ্চিত লক্ষ্যযুক্ত, পার্থিব দেহকে যিনি রথস্বরূপ বিবেচনা করেছেন, সেই পার্থ উভয় পক্ষের সেনাদলের মধ্যে পিতৃব্যগণকে, পিতামহগণকে, আচার্যগণকে, মাতুলগণকে, ভ্রাতাগণকে, পুত্রগণকে, পৌত্রগণকে, মিত্রগণকে, শ্বশুরগণকে ও সুহৃদ্‌গণকে অবস্থিত দেখলেন। উভয় সেনাদলের মধ্যে অর্জুন কেবল নিজের পরিবার, মামার পরিবার, শ্বশুরের পরিবার, সুহৃদ্ ও গুরুজনদের দেখতে পেলেন। মহাভারতকালের গণনানুসারে আঠারো অক্ষৌহিনী আনুমানিক চল্লিশ লক্ষ্যের সমকক্ষ হবে, কিন্তু প্রচলিত গণনানুসারে আঠারো অক্ষৌহিনী আনুমানিক সাড়ে ছয় আরব সংখ্যায় হবে, যা আজকের বিশ্বের জনসংখ্যার সমকক্ষ। আজ সমগ্র বিশ্বে মাত্র ততই জনসমূহের জন্য বিশ্বস্তরে আবাস, খাদ্য ও জনসংখ্যার সমস্যা সমুপস্থিত। এই বিশাল জনসমূহ অর্জুনের তিন-চারটি আত্মীয়ের পরিবারই মাত্র ছিল। এতবিশাল পরিবার কি কারও হয়? কখনই না। এ সকলই হৃদয়-দেশের ছবি।

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধুনবস্থিতান্ ।। ২৭।।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ।

কুন্তীপুত্র অর্জুন সেই বন্ধুগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত দেখে অত্যন্ত করুণাপূর্ণ হয়ে শোক করতে লাগলেন, কারণ দেখলেন এরা সকলেই তাঁর নিজের আত্মীয় স্বজন, অতএব বললেন—

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুং সমুপস্থিতম্ ।। ২৮।।

সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখং চ পরিশুষ্যতি।

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ।।২৯।।

হে কৃষ্ণ! আত্মীয় স্বজনকে যুদ্ধার্থ উপস্থিত দেখে আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গা অবসন্ন ও মুখ শুষ্ক হচ্ছে। আমার শরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হচ্ছে। কেবল এতটাই নয়—

গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাত্ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে।

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ ।। ৩০।।

হাত থেকে গাণ্ডীব খসে পড়ছে এবং চর্ম যেন দগ্ধ হচ্ছে। তিনি সন্তপ্ত হয়ে উঠেছেন যে, এই যুদ্ধ কি ধরনের, যার মধ্যে শুধু স্বজনই দাঁড়িযে? অর্জুনের ভ্রম হয়েছিল। তিনি বললেন—এখন আমি দাঁড়াতেও অসমর্থ, এখন এর বেশী দেখার সামর্থ্য নেই।

নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব।

ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে ।। ৩১।।

হে কেশব! এই যুদ্ধের লক্ষণও বিপরীত দেখছি। যুদ্ধে আত্মীয়দের বধ করলে মঙ্গল হবে, এও দেখি না। কুলকে বধ করলে কল্যাণ কিরূপে সম্ভব?

ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ।। ৩২।।

সম্পূর্ণ পরিবার যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছেন। এঁদের যুদ্ধে বধ করে বিজয়, বিজয়ের দ্বারা প্রাপ্ত রাজ্য ও রাজ্যসুখ অর্জুন চান না। তিনি বললেন— হে কৃষ্ণ! আমি বিজয় চাই না, রাজ্য এবং সুখভোগও কামনা করি না। হে গোবিন্দ! আমাদের রাজ্যে কি

প্রয়োজন, আর সুখভোগ বা জীবন ধারণেই কি প্রয়োজন? কেন? এর উত্তরে বললেন—

যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।

ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ ।। ৩৩।।

যাঁদের জন্য রাজ্য, ভোগ ও সুখাদি আমার অভিলষিত, সেই স্বজনগণই প্রাণের আশা ত্যাগ করে যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছেন। আমার রাজ্য অভিলষিত ছিল তো পরিবার নিয়ে, ভোগ-সুখ ও ধনাদির পিপাসা ছিল তো স্বজন ও পরিবারকে নিয়ে ভোগ করার ছিল; কিন্তু যখন তারা সকলেই প্রাণের আশা ত্যাগ করে যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছেন, তো আমার সুখ, ভোগ বা রাজ্যের প্রয়োজন নেই। এ সকলই এদের জন্য প্রিয় ছিল। এদের থেকে পৃথক্ হয়ে এ সকলের আমার আর প্রয়োজন নেই। যতক্ষণ পরিবার থাকে ততক্ষণ এই কামনাগুলিও থাকে। কুঁড়েঘরে বাস করে যে ব্যক্তি, সেও নিজের পরিবার, বন্ধু ও আত্মীয়দের বধ করে বিশ্বের সাম্রাজ্য স্বীকার করবে না। অর্জুনের বক্তব্য এই যে ভোগ, যুদ্ধে জয়লাভ আমি চেয়েছিলাম; কিন্তু যাদের জন্য চেয়েছিলাম, যখন তারাই থাকবে না, তখন আর আমার ভোগের কি প্রয়োজন? এই যুদ্ধে আমি কাকে বধ করব?—

আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ।

মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ।। ৩৪।।

এই যুদ্ধে আচার্যগণ, পিতৃব্যগণ, পুত্রগণ, পিতামহগণ, মাতুলগণ, শ্বশুরগণ, পৌত্রগণ, শ্যালকগণ ও স্বজনগণই উপস্থিত হয়েছেন।

এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে।। ৩৫।।

হে মধুসূদন! এঁরা আমাকে বধ করলেও, ত্রৈলোক্য রাজ্যের জন্যও আমি এঁদের বধ করতে চাই না; পৃথিবী মাত্র রাজ্যের জন্য কি কথা?

আঠারো অক্ষৌহিনী সেনার মধ্যে অর্জুন কেবল নিজের পরিবারকেই দেখতে পেয়েছিলেন, এত অধিক স্বজন বাস্তবে কারা? বস্তুতঃ অনুরাগই অর্জুন। ভজনের শুরুতে প্রত্যেক অনুরাগীর সমক্ষে এই সমস্যাই দেখা দেয়। সকলেই চায় ভজন

করে, পরম সত্যকে লাভ করতে, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী সদগুরুর সংরক্ষণে অনুরাগী সাধক যখন ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংঘর্ষ অনুভব করেন, তাঁকে কার কার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে বুঝতে পারেন, তখনই হতাশ হয়ে পড়েন। তিনি চান তাঁর পিতার পরিবার, শ্বশুরের পরিবার, মামার পরিবার, সুহৃদ্, বন্ধু ও গুরুজন সঙ্গে থাকুন, সকলেই সুখী থাকুন এবং এঁদের সকলকে ব্যবস্থিত করে তিনি পরমাত্ম-স্বরূপ লাভও করে নেবেন। কিন্তু যখন জানতে পারেন, আরাধনার পথে অগ্রসর হতে হলে পরিবার ত্যাগ করতে হবে, এই সম্বন্ধগুলির মোহ থেকে মুক্ত হতে হবে, তখন তিনি অধীর হয়ে ওঠেন।

পূজ্য মহারাজজী বলতেন- "মৃত্যু হওয়া ও সাধু হওয়া একই ব্যাপার। সাধুর জন্য এই পৃথিবীতে কেউ জীবিত থাকলেও; গৃহ সম্বন্ধীয় কেউই থাকবে না। যদি থাকে, তাহলে সম্বন্ধ বিদ্যমান, মোহ শেষ হয়েছে কোথায়? পূর্ণ ত্যাগ অর্থাৎ সম্বন্ধের অস্তিত্ব বিলীন হবার পরেই সাধক জয়লাভ করেন। এই সম্বন্ধগুলির প্রসারই জগৎ, অন্যথা জগতে আমার বলে কি আছে?" **'তুলসীদাস কহ চিদ্‌বিলাস জগ, বুঝত বুঝত বুঝৈ।' (বিনয়পত্রিকা, ১২৪)** অর্থাৎ মনের প্রসারই এই জগৎ। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণও মনের প্রসারকেই জগৎ বলে সম্বোধন করেছেন। যিনি এর প্রভাব রোধ করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি চরাচর বিশ্ব জয় করেছেন। **"ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।" (গীতা, ৫/১৯)**

এমন কথা নয় যে কেবল অর্জুনই অধীর ছিলেন, সকলের হৃদয়েই অনুরাগ আছে। প্রত্যেক অনুরাগীই ব্যাকুল হন। আত্মীয় স্বজনের স্মৃতি তাঁকে ব্যাকুল করে। সাধনারম্ভে প্রত্যেক সাধক চিন্তা করেন যে ভজন করে কিছু লাভ হলে, এদের সঙ্গে তা ভোগ করা যাবে, সকলেই সুখী হবে; কিন্তু যখন এরা সঙ্গে থাকবে না, তখন সুখের আর কি প্রয়োজন? অর্জুনের দৃষ্টি রাজ্য-সুখপর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি ত্রিলোকের সাম্রাজ্যকেই সুখের পরাকাষ্ঠা ভেবেছিলেন। এর বেশী কোন সত্য আছে, একথা অর্জুন এখনও জানেন না।

নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন।
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ ।। ৩৬।।

হে জনার্দন! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে বধ করলে আমাদের কি সুখ হবে? যেখানে ধৃতরাষ্ট্র অর্থাৎ ধৃষ্টতার রাষ্ট্র, তার থেকে উৎপন্ন মোহরূপ দুর্যোধনাদিকে বধ করলে

আমাদের কি আনন্দ হবে? এই সকল আততায়ীকে বধ করলে আমাদেরকে পাপই আশ্রয় করবে। জীবন-যাপনের তুচ্ছ লাভের জন্য যে অনীতির সাহায্য নেয়, তাকে আততায়ী বলে; কিন্তু যে আত্মোন্নতির পথে অবরোধ সৃষ্টি করে, সে আরও বড় আততায়ী। আত্মদর্শনে বাধক কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদিই আততায়ী।

তস্মান্নার্হাঃ বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব।। ৩৭।।

অতএব হে মাধব! স্বীয় বান্ধব ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে আমাদের বধ করা উচিত নয়। স্ব-বান্ধব কিরূপে? তারা সকলেই তো শত্রু ছিল। বস্তুতঃ শরীরের আত্মীয়তা অজ্ঞানজনিত। ইনি মামা, শ্বশুরবাড়ি, স্বজন সমুদায় এসকলই অজ্ঞান। যখন এই দেহটাই নশ্বর, তখন এর কুটুম্বিতাই কি করে শাশ্বত হবে? যতক্ষণ মোহ, ততক্ষণই আমার সুহৃদ্, আমার পরিবার, আমার জগৎ। মোহ নেই তো কিছুই নেই। সেই জন্য অর্জুন শত্রুদেরও স্বজনরূপেই দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি বলছেন যে নিজ কুটুম্বকে বধ করে আমরা কিরূপে সুখী হব? যদি অজ্ঞান ও মোহ না থাকে তবে কুটুম্বেরও কোন অস্তিত্ব নেই। এই অজ্ঞানই আবার জ্ঞানেরও প্রেরক। ভর্তৃহরি, তুলসীদাস ইত্যাদি অনেক মহাপুরুষগণ বৈরাগ্যের প্রেরণা তাঁদের স্ত্রীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন। কেউ বা বিমাতার ব্যবহারে ব্যথা পেয়ে বৈরাগ্যের পথে এগিয়ে গেছেন দেখা গেছে।

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্।। ৩৮।।

যদিও এরা লোভে অভিভূত হয়ে কুলনাশজনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহে যে পাপ হয়, তা দেখছে না, এ দোষ তাদের, তাসত্ত্বেও–

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দন।। ৩৯।।

হে জনার্দ্দন! কুলনাশজনিত দোষ উপলব্ধি করেও আমরা এই পাপ থেকে নিবৃত্ত হব না কেন? কেবল আমিই পাপ করছি এমন কথা নয়, আপনিও ভুল করছেন– শ্রীকৃষ্ণের উপরও দোষারোপ করলেন। এখনও তিনি নিজেকে বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে কম মনে করছেন না। প্রত্যেক নতুন সাধক সদ্‌গুরুর শরণাগত

হবার পরে এই ধরণের তর্ক করেন এবং নিজে যে কম জানেন তা ভাবেন না। একথাই অর্জুনও বলছেন যে এরা না বুঝুক, কিন্তু আমরা তো বুদ্ধিমান। কুলনাশজনিত দোষের উপর আমাদের অবশ্যই বিচার করা উচিত। কুলনাশে কি কি দোষ হয়?—

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোঽভিভবত্যুত।।৪০।।

কুলনাশে সনাতন কুলধর্ম নষ্ট হয়। অর্জুন কুলধর্ম, কুলাচারকেই সনাতন ধর্ম বলে মনে করেছিলেন। ধর্ম নষ্ট হলে সম্পূর্ণ কুলকে পাপ দাবিয়ে দেয়।

অধর্মাভিভবাৎকৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ।। ৪১।।

হে কৃষ্ণ! পাপের বৃদ্ধি হলে কুলস্ত্রীগণ কলুষিত হয়। হে বার্ষ্ণেয়! স্ত্রীগণ কলুষিত হলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়। অর্জুনের দৃষ্টিকোণে কুলস্ত্রীগণ কলুষিত হলে বর্ণসঙ্কর দেখা দেয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এই সিদ্ধান্তের খণ্ডন করে আরও বলছেন—"আমি অথবা স্বরূপস্থিত মহাপুরুষ যদি আরাধনা ক্রমে ভ্রম উৎপন্ন করেন, তাহলে বর্ণসঙ্কর দেখা দেয়। বর্ণসঙ্করের দোষের উপর অর্জুন আলোকপাত করছেন—

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ।। ৪২।।

বর্ণসঙ্কর হলে কুলনাশকগণ এবং কুল নরকে পতিত হয়। যাদের পিণ্ডক্রিয়া লুপ্ত হয়েছে, তাদের পিতৃপুরুষগণও পতিত হন। বর্তমান নষ্ট হয়, পিতৃপুরুষগণ স্খলিত হন ও উত্তর পুরুষদেরও পতন হবে। কেবল এই নয়—

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ।। ৪৩।।

এই সকল বর্ণসঙ্করকারক দোষের দ্বারা কুল এবং কুলঘাতকগণের সনাতন কুলধর্ম ও জাতিধর্ম নষ্ট হয়। অর্জুন মনে করতেন যে, কুলধর্ম সনাতন, কুলধর্মই শাশ্বত; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ একথা খণ্ডন করে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে বললেন—"আত্মাই সনাতন, শ্বাশত ধর্ম।" বাস্তবিক সনাতন ধর্মকে জানার আগে মানুষ ধর্মের নামে কোন না কোন চিরাগত কুরীতি মেনে চলে। তেমনিই অর্জুনও যা জানতেন, শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে তা কুপ্রথা।

উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন।
নরকেঽনিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম।। ৪৪।।

হে জনার্দন ! যাদের কুলধর্ম নষ্ট হয়েছে, তাদের অনন্তকাল নরকে বাস করতে হয়, এইরূপ আমি শুনেছি। কেবল কুলধর্মই নষ্ট হয় না, বরং শাশ্বত সনাতন ধর্মও নষ্ট হয়ে যায়। যাদের ধর্ম নষ্ট হয়, তাদের অনন্তকালপর্যন্ত নরকে বাস করতে হয়, এটা আমি শুনেছি। দেখিনি, কেবল শুনেছি।

অহো বত মহৎপাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ।। ৪৫।।

হায় ! দুঃখের বিষয় যে আমরা বুদ্ধিমান্ হয়েও মহাপাপ করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। রাজ্যসুখের লোভে নিজকুলকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছি।

এখনও পর্যন্ত অর্জুন নিজেকে কম জ্ঞাতা বলে মনে করছেন না। শুরুতে প্রত্যেক সাধক এইরূপ বলেন। মহাত্মা বুদ্ধও বলেছেন যে– মানুষ আংশিক অবগত হলে, নিজেকে মহাজ্ঞানী বলে মনে করেন, ও যখন অর্ধেকের বেশী অবগত হন তখন নিজেকে মহামুর্খ বলে মনে করেন। তেমনিই অর্জুনও নিজেকে জ্ঞানীই ভাবছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকেই বোঝাচ্ছেন যে, এই পাপ থেকে পরমকল্যাণ হবে এমন কথাও নয়, কেবল রাজ্যসুখের লোভে পড়ে আমরা কুলনাশ করতে উদ্যত হয়েছি, খুব ভুল করছি। কেবল আমিই ভুল করছি এমন কথা নয়, আপনিও ভুল করছেন। শ্রীকৃষ্ণের উপরও দোষারোপ করলেন। অবশেষে অর্জুন নির্ণয় করলেন–

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ।। ৪৬।।

প্রতিকাররহিত ও নিরস্ত্র আমাকে যদি শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ যুদ্ধে বধও করেন, তাতে আমার জন্য অতি কল্যাণকর হবে। ইতিহাস তো বলবে যে অর্জুন জ্ঞানী ছিলেন, তাই আত্মবলি দিয়ে যুদ্ধ হতে দেননি। সন্তান-সন্ততির সুখের জন্য, কুলের জন্য লোকে প্রাণের আহুতি পর্যন্ত দেয়। বিদেশে গিয়ে বৈভবপূর্ণ প্রাসাদে থাকলেও অল্পদিনের মধ্যেই নিজের কুঁড়েঘরের কথা মনে পড়ে। মোহ এত প্রবল হয়। তাই অর্জুন বললেন যে, শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ প্রতিকারে অনিচ্ছুক আমাকে যদি যুদ্ধে বধও করেন, তবু তা আমার জন্য অতি কল্যাণকর হবে, পরিবার তো সুখী থাকবে।

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বার্জুনঃ সঙ্খ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ।। ৪৭।।

সঞ্জয় বললেন—রণভূমিতে শোক-সন্তপ্ত অর্জুন এইরূপ বলে ধনুর্বাণ ত্যাগ করে রথের পশ্চাদভাগে বসে পড়লেন অর্থাৎ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংঘর্ষ থেকে সরে দাঁড়ালেন।

নিষ্কর্ষ ঃ

গীতাশাস্ত্রে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের যুদ্ধের বর্ণনা করা হয়েছে। ঈশ্বরীয় বিভূতিসম্পন্ন ভগবৎ স্বরূপের সম্যক্ দর্শন করবার গায়ন হ'ল এই গীতাশাস্ত্র। যে ক্ষেত্রে এই গায়ন সম্পাদন করা হয়, সেই যুদ্ধক্ষেত্র এই 'শরীর'। যার অন্তরালে দুটি প্রবৃত্তি বিরাজমান—'ধর্মক্ষেত্র ও কুরুক্ষেত্র'। যুদ্ধে প্রবৃত্ত সেনাসমূহের স্বরূপ ও তাদের শক্তির আধার বর্ণিত হয়েছে, শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে এদের পরাক্রম নির্ধারিত করা হয়েছে। তদনন্তর যে সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করার ছিল, তাদের নিরীক্ষণ করা হল। এদের গণনা আঠারো অক্ষৌহিনী অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ছয় আরব বলা হয়, কিন্তু এরা অনন্ত। এই প্রকৃতির দৃষ্টিকোণ দুটি—একটি ইষ্টোন্মুখী প্রবৃত্তি—'দৈবী সম্পদ্', দ্বিতীয়টি বহির্মুখী প্রবৃত্তি—'আসুরী সম্পদ্'। দুটিই প্রকৃতি। একটি ইষ্টের দিকে উন্মুখ করে, পরমধর্ম পরমাত্মার দিকে নিয়ে যায়, অন্যটি প্রকৃতিতে বিশ্বাস করায়। প্রথমে দৈবী সম্পদের বৃদ্ধি করে, আসুরী প্রবৃত্তিগুলিকে নিঃশেষ করা হয়, তারপর শাশ্বত সনাতন পরব্রহ্মের দিগ্‌দর্শন ও তাঁতে স্থিতি লাভের পর দৈবী প্রবৃত্তিগুলির প্রয়োজনীয়তাও ফুরিয়ে যায় এবং যুদ্ধের পরিণাম দৃষ্টিগোচর হয়।

সৈন্য নিরীক্ষণের সময় অর্জুন কেবল নিজের পরিবারকেই দেখতে পেয়েছিলেন। যাঁদের বধ করার কথা ছিল, তাঁরা স্বজনই ছিলেন। জীবের যতদূর পর্যন্ত সম্বন্ধ থাকে, জগতের বিস্তারও তারজন্য ততদূর পর্যন্তই। অনুরাগের আরম্ভিক অবস্থায় পারিবারিক মোহই বাধা দেয়। সাধক যখন দেখেন পরিবারের মধুর সম্বন্ধ থেকে তাঁর এতদূর বিচ্ছেদ হবে, যেন তা কখনও ছিল না, তখন তিনি ব্যাকুল হন। স্বজনাসক্তি ত্যাগ করার পথে যতরকমের অকল্যাণই দেখতে পান তিনি কুপ্রথার মাধ্যমে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেন, ঠিক যেমন অর্জুন করেছিলেন। তিনি

বলেছিলেন—"কুলধর্মই সনাতন ধর্ম। এই যুদ্ধ হলে সনাতন ধর্ম লোপ পাবে। কুলস্ত্রীগণ ভ্রষ্টা হবে এবং বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হবে। তাদের জন্ম কুল ও কুলনাশকদের অনন্তকালপর্যন্ত নরকে বাস করার জন্যই হয়ে থাকে।" অর্জুন নিজবুদ্ধি অনুসারে সনাতন ধর্মের রক্ষার জন্য ব্যাকুল ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন যে আমরা বুদ্ধিমান্ হয়ে এই মহাপাপ কেন করব ? অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণও পাপ করতে যাচ্ছেন। অবশেষে পাপ থেকে বাঁচবার জন্য "আমি যুদ্ধ করব না"-এই কথা বলে অর্জুন ধনুর্বাণ ত্যাগ করে হতাশ হয়ে রথের পশ্চাদভাগে বসে পড়লেন; ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংঘর্ষ থেকে সরে দাঁড়ালেন।

টীকাকারগণ বর্তমান অধ্যায়ের নামকরণ 'অর্জুন বিষাদযোগ' করেছেন। অর্জুন অনুরাগের প্রতীক। সনাতন ধর্মের জন্য ব্যাকুল অনুরাগীর বিষাদ যোগই কারণ হয়। এই বিষাদ মনুর হয়েছিল—**'হৃদয় বহুত দুঃখ লাগ, জনম গয়উ হরি ভগতি বিনু।' (রাম. ১/১৪২)** সংশয়ে পড়েই মানুষ বিষাদ করে। অর্জুনের সন্দেহ হয়েছিল যে, বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হবে, যারা নরকে নিয়ে যাবে। সনাতন ধর্মলোপ পাবে এই বিষাদও তাঁর হয়েছিল। অতএব 'সংশয়-বিষাদ যোগ' এর সামান্য নামকরণ বর্তমান অধ্যায়ের জন্য উপযুক্ত বলে মনে হয়। অতঃ—

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে 'সংশয়বিষাদযোগো' নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।। ১।।

এই প্রকার শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতারূপী উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের সংবাদে 'সংশয়-বিষাদ যোগ' নামক প্রথম অধ্যায় পূর্ণ হল।

ইতি শ্রীমৎ পরমহংসপরমানন্দস্য শিষ্যস্বামীঅড়গড়ানন্দকৃতে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-গীতায়াঃ 'যথার্থ গীতা' ভাষ্যে 'সংশয়বিষাদযোগো' নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।।১।।

এই প্রকার শ্রীমৎ পরমহংস পরমানন্দজীর শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃত 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা'র ভাষ্য 'যথার্থ গীতা'তে 'সংশয়-বিষাদ যোগ' নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হল।

।। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।।